ইসলাম মানবতার ধর্ম

ডঃ মুস্তাফা আস্-সাবায়ী

মুস্তাফা আস্-সাবায়ী

ইসলাম ঃ মানবতার ধর্ম

আবদুল মতীন জালালাবাদী
অনূদিত

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলাম ঃ মানবতার ধর্ম
মুস্তফা আস্-সাবায়ী
আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত

ইসাকেডা প্রকাশনা ৬০
ইফা প্রকাশনা ৬০৬

প্রকাশক
মুহম্মদ মুনসুর-উদ্-দৌলা পাহলোয়ান
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররাম (তেতলা), ঢাকা-২

প্রথম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৮০
আষাঢ় ১৩৮৭ ঃ শাবান ১৪০০

মুদ্রক
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪ শিরিশ দাস লেন
ঢাকা-১

মূল্য ঃ এক টাকা মাত্র।

ISLAM MANOBOTAR DHARMA (Islam Religion of Humanity) : Written by Mustafa As-Sabayee, translated by Abdul Mateen Jalalabadi and published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Dacca-2, Islamic Foundation, Bangladesh. Price : Taka One Only.

আমাদের কথা

তথাকথিত আধুনিকতার অনেক দাবীদারই মানবতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানকে স্বীকৃতি দান করতে পরাঙ্মুখ। ইতিহাসের কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছেই মানবতার বিকাশে ইসলামের অপরিসীম অবদান অস্বীকৃত হবার কথা নয়। বরং সত্যের খাতিরে বলতে হয়—আধুনিক যুগের বিভিন্ন মতবাদসহ বিশ্ব-ইতিহাসের তাবৎ সভ্যতার চাইতেও মানবতার বিকাশে ইসলামের অবদান ঢের বেশী। এই সত্যটিকে তত্ত্বগত ও তথ্যগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ডঃ মুস্তফা আস-সাবায়ী। তাঁর এই মূল্যবান রচনার বাংলা তরজমা পুস্তিকা-কারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
৩০. ৬. ৮০.

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক

যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইসলামী সভ্যতা ও তার আনুষঙ্গিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইসলামী সভ্যতার শিরা-উপশিরায় মানবতার প্রবল স্রোতধারা যেভাবে সঞ্চালিত তাতে তা বিশ্বের যাবতীয় সভ্যতার শীর্ষে স্থান পাবার যোগ্য। প্রকৃত-পক্ষে মানবতাই হচ্ছে ইসলামী সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই ইসলাম মানবজাতিকে দলাদলি, রেষারেষি ও পক্ষপাতিত্বের সংকীর্ণ পরিবেশ ও বর্ণ বৈষম্যের ঘিঞ্জিগলি থেকে এমন এক মুক্ত পরিবেশে নিয়ে আসে যেখানে আছে শুধু শালীনতা ও বন্ধুত্বের প্রাণমাতানো সমীরণ, আর প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার সুমধুর সুরলহরী—যেখানে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর, একদল অপর দলের উপর কিংবা একজাতি অন্য জাতির উপর জুলুম-অত্যাচারের কোন সুযোগই পায় না। ইসলামের এই অনুপম বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে কিংবা তার ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই নয়, বরং সামাজিক আইনকানুন ও শান্তিশৃংখলার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যমান। ইসলামী সভ্যতার প্রতিটি বিভাগ ও প্রতিটি স্তর এই বৈশিষ্ট্যের মহিমায় মহিমান্বিত। ইসলামের সত্যিকার অনুসারিদের কর্মজীবন তো এই বৈশিষ্ট্যের এক একটি বাস্তব উদাহরণ ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামী সভ্যতায় মানবতার প্রভাব সর্বপ্রথম নজরে পড়ে তখন যখন দেখা যায় সে গোটা মানবজাতিকে একই পিতার সন্তান বলে ঘোষণা করেছে। কুরআন বলেঃ

> হে মানবজাতি, তোমাদের প্রভুকে ভয় ক'রে চল। তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সহধর্মিণীকেও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ একই স্বামী-স্ত্রী হতে তিনি অসংখ্য নর-নারীর বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই একই বংশের অন্তর্গত। তাদের মধ্যে জাতিগত যে পার্থক্য রয়েছে তা মোটেই লক্ষণীয় বিষয় নয়। কেননা এই পার্থক্য একই ঔরসজাত সন্তানের পার্থক্যের সমান। মানুষ শাখা-প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূল তাদের একই। গোটা মানবজাতি যখন

একই বংশোদ্ভূত তখন তাদের মধ্যে পরস্পর স্নেহ, ভালবাসা সাহায্য-সহায়তা ও উপকার সাধনের প্রবল আগ্রহ থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর ইসলাম এক অভিনব পদ্ধতিতে মানবতার আর একটি দিক বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এই বিশেষ দিকটির প্রতি মানব-জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

> হে মানবজাতি আমি তোমাদের একই স্ত্রীলোক ও একই পুরুষ হতে সৃষ্টি করেছি। আর পরস্পর পরিচয় লাভের জন্যই আমি তোমাদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের প্রবর্তন করেছি।

অতঃপর ইসলাম মানব জীবনের আর একটি বিশেষ অবস্থার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর তা হলো, এই জীবন সংগ্রামে কেউ জয়ী হয়, কাউকে আবার পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে হয়। কেউ প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে, কারো আবার অন্ন—বস্ত্রেরই সংস্থান হয় না। কেউ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়, কাউকে আবার বাধ্যতামূলকভাবে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। কারো গায়ের রং কালো, কারো সাদা, কারো হলদে, কারো বা অন্য কিছু।

ইসলামের মতে, মানব জীবনে এই সমস্ত পার্থক্য থাকাটা একান্ত স্বাভাবিক। পার্থিব জীবনের সাথে এই সমস্ত বৈপরীত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত কিংবা শক্তি-সামর্থ্য ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী, তা তাদের পার্থিব মর্যাদা বা ক্ষমতাবলে ক্ষমতাহীন কিংবা শাসিতদের দন্ডমুন্ডের মালেক হয়ে বসবে। এর অর্থ এইও নয় যে, শেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের দেখলে নাক সিটকাবে। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ এই যে, খোদার দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমমর্যাদার অধিকারী। তবে হ্যাঁ, সততা ও খোদাভীতির তারতম্য অনুসারে তাদের মর্যাদারও তারতম্য ঘটতে পারে। কুরআন বলে ঃ—

> নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশী ভয় করে।

অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান। একমাত্র সততার ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজের প্রত্যেক লোকই সমমর্যাদার অধিকারী। অতএব সবল দুর্বলকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে পারে না—এবং কিছুসংখ্যক লোককে দুঃখ-সাগরে ভাসিয়ে বাকী লোক আমোদ-স্ফূর্তিতে ডুবে থাকতে পারে না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতির দিক দিয়ে মুসলমানরা যেন একই দেহের বিভিন্ন অংশ। যখন এই দেহের কোন একটি অংশে আঘাত লাগে, তখন গোটা দেহেই ছড়িয়ে পড়ে তার প্রতিক্রিয়া—প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

শুধুমাত্র উপরোক্ত কথাগুলোই নয় বরং কুরআন—হাদীসে এমন আরো অনেক কথা আছে যা মানবজাতির সমজাতীয়তা ও সমগোত্রীয়তার এক একটি অকাট্য দলিল।

কুরআন মানবজাতিকে 'হে নবী আদম', 'হে মানব জাতি' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছে। আর যখন ইসলামপন্থীদের সম্বোধন করার আবশ্যক বোধ করছে তখন 'হে মুসলিমগণ' বা এই জাতীয় কোন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছে। 'হে পরাক্রমশালী মানবগোষ্ঠি' বা 'হে শ্বেতাঙ্গ মুমিনগণ'—এজাতীয় শব্দের কোন সম্বোধন কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই। সমগ্র মানবজাতি হোক কিংবা কোন একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারীই হোক—সকলকেই একই সমতলে দাঁড় করিয়েছে। সম্মান, মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র কিংবা সাদা, কালোর প্রশ্ন কখনো উত্থাপন করেনি।

কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তর বা মৌলিক বিষয়সমূহেই নয়, বরং ইসলামী আইনের প্রত্যেকটি ধারা-উপধারা এবং প্রত্যেকটি আদেশ-নির্দেশেই মানবতার গভীর অনুভূতি বিদ্যমান। প্রথমে নিখুঁত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথাই ধরুন। নামাযের মধ্যে, ইসলাম সমস্ত মানবজাতিকে একই সারিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহতা'লার বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছে। আমির-উমরা কোন বিশেষ সারিতে দাঁড়াবেন—এমন ব্যবস্থা ইসলামের বিধি বহির্ভূত। রমযান মাসে ইসলাম সকলকেই ভুখা থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহ কিংবা অর্থ বিত্তশালীদের কোনরূপ কনসেশনের ব্যবস্থা নেই। হজ্জের মধ্যে সকলকে একই পোশাক পরিধান করতে হয়, একই স্থানে দাঁড়িয়ে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। আরব-অনারব, দেশী-বিদেশী কিংবা বিশিষ্ট-অবিশিষ্টের কোন প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয় না।

শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বরং ইসলামী মূলনীতির প্রত্যেকটি ধারা-উপধারা প্রণীত হয়েছে মানবতা তথা ন্যায়নীতিকে কেন্দ্র করে। ইসলামী আইন মজলুম ও উৎপীড়িতের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, আর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জালিম ও শোষকদের বিরুদ্ধে। ইসলামী দন্ডবিধি শাসক-শাসিত কিংবা উঁচু-নীচুর মধ্যে কোন তফাৎ করে না। উচ্চবংশ কিংবা পার্থিব উচ্চমর্যাদার আবদার এখানে খাটে

না। যে কেউই হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে, ইসলামী আইন তার উপর তৎক্ষণাৎই মৃত্যুদন্ডাদেশ জারী করবে—হোক না সে যত বড় বিত্তশালী কিংবা শৌর্যবীর্যের মালিক। যে কেউ চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অপরাধী হবে, ইসলামী আইন তাকে নির্দ্বিধায় যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিক্ষিত না মূর্খ, কৃষক না ব্যবসায়ী, স্বদেশী না বিদেশী, ধনী না নির্ধন, প্রাচ্য দেশীয় না পাশ্চাত্য দেশীয়, শ্বেতাঙ্গ না অশ্বেতাঙ্গ এ সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন ইসলামী আদালতে উত্থাপিত হতে পারে না।

ইসলাম বর্ণ, ধর্ম কিংবা এই জাতীয় কোন কিছুর দিকেই তাকায় না, সমতা তথা মানবতাকেই সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানুষই সম্মানিত এবং সমমর্যাদার অধিকারী। কুরআন বলে ঃ—

> ইহা এমন একটি বিশেষত্ব যার মাধ্যমে আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি।

আল্লাহ্‌তা'লা মানবজাতিকে যে ভাবে উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছেন তাতে প্রতিটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক অধিকারের সমান অধিকারী। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তাদেরকে এই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না বরং অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে তা সংরক্ষণেরই ব্যবস্থা করে।

ইসলাম কেবলমাত্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের ধারা-উপধারা মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মানুষের সংকল্প ও নিয়াতকে যাবতীয় কর্মের পরিণাম-নিয়ন্তা ঘোষণা করে মানবতাকে যেরূপ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মানুষ মাত্রেই নিজেকে গৌরবান্বিত ও স্রষ্টার সার্থক সৃষ্টি না ভেবে পারে না। ইসলাম বলে, 'কাজের শাস্তি বা পুরস্কার মানুষের নিয়াতের উপর নির্ভরশীল।' ইসলামের দৃষ্টিতে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বা আন্তরিকতাশূন্য কাজের কোনই মূল্য নেই। কুরআন বলে ঃ

> আল্লাহ্‌তালা তোমাদের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের দিকে নয় বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়াত অনুসারেই কাজের ফলাফল পাবে। মানুষ কেবলমাত্র ঐ সমস্ত কাজের পুরস্কার পাবে যার মধ্যে আল্লাহ্‌তালার সন্তুষ্টিলাভ ও মানুষের হিত সাধনের সদিচ্ছা রয়েছে। যে কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নিহিত, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কাজের কোন মূল্য নেই। কুরআন বলে ঃ—

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকেরই দাসত্ব এবং সৎকাজ করতে থাক; তা হলেই মুক্তি লাভ করতে পারবে।

সৎকাজ—যা একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়, তাতে দাতা গ্রহীতার নিকট হতে কোনরূপ প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা লাভের আশা রাখে না। কুরআনের ভাষায় খাঁটি মুমিনের সংজ্ঞা হলো, যারা আবশ্যক পূরণের পর যা হাতে থাকে তা দ্বারা নিরাশ্রয়, অনাথ ও বন্দীদের ক্ষুধা নিবারণ করে এবং বলে (মনে মনে) আমরা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-লাভের জন্য তোমাদের ক্ষুধা নিবারণ করছি। তোমাদের নিকট হতে কোনরূপ প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা লাভের কু-মতলব আমাদের নেই।

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা মুমিনদের অন্তরে মানবতাবোধ জাগ্রত করাই আল্লাহ্‌তালার উদ্দেশ্য। ইসলাম মানুষকে আরো একটি মহান স্তরের দিকে আহ্বান করে যার কথা দুনিয়ার যাবতীয় সভ্যতার কাছে প্রায় অবিদিত রয়ে গেছে। ইসলাম বলে, মনুষ্যজগৎ, জীবজগৎ, বস্তু ও জড় জগৎ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু, পরমাণু আল্লাহ্‌তালার দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ। আল্লাহতালা যেদিকে পরিচালনার ইচ্ছা করেন প্রতিটি বস্তু বিনা দ্বিধায় সেদিকেই চলতে শুরু করে। নামাযের প্রতিটি রাকাতে মুমিনরা যে সত্য—অতিসত্য কথাটি বার বার উচ্চারণ করে থাকে তা হ'ল, "একমাত্র আল্লাহ্‌তালাই যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক এবং পরম দয়ালু।"

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কুরআন একথাটি ঘোষণা করতে চায় যে, মানুষ ঐ সৃষ্টিরই অংশ বিশেষ যার স্রষ্টা মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালা। তিনি বিশ্বপালক ও পরম দয়ালু। কুরআন মুসলমানদের এটাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। এখানে নিজের স্বার্থকে এত বড় করে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। মুসলমানরা মানবজাতির হিতসাধনে নিয়োজিত হয়ে আল্লাহ্‌তালার মহৎ গুণ 'করুণা'কে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করুক—এটাই আল্লাহ্‌তালার একান্ত ইচ্ছা। তারা আল্লাহ্‌তালার যে অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করছে তা থেকে মানবজাতিকে কখনো যেন বঞ্চিত না রাখে।

উপরের বর্ণনা থেকে বুদ্ধিমান মাত্রেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন, মানবতার প্রতি ইসলামী সভ্যতার কী গভীর আকর্ষণই না রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, ইসলামী সভ্যতা হচ্ছে মানবতারই প্রতিচ্ছবি। এতদ্‌সত্ত্বেও কেউ কেউ এই ভ্রান্তমত পোষণ করতে পারেন যে, ইসলাম

নিছক নীতি প্রচারের খাতিরেই মানবতার প্রতি এত দরদ দেখিয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে যখন ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং এর জয়ডংকা বেজে উঠল দিকে দিকে—তখন সে এই সমস্ত উদারনীতিকে কার্যকরী করেছিল বলে তো মনে হয় না। ইসলামী সভ্যতার এই ঘোষণা জাতি-সংঘের মানবাধিকার সনদের মতও তো হতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই আজ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মানবাধিকার দিবস পালন করে থাকে, অথচ বছরের প্রতিটি মাসে, মাসের প্রতিটি দিনে এবং দিনের প্রতিটি ঘণ্টায়ই তারা জালিমের মত পদদলিত করে চলেছে মানবাধিকারের পবিত্র সনদকে।

এটাও তো হতে পারে যে, ইসলাম মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই মানবতার শ্লোগান তুলেছিল। এর মূলে কোন আন্তরিকতা ছিল না, যেমন দুনিয়ার কোন কোন বৃহৎ শক্তি নিজ নিজ দেশে স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে দুনিয়াবাসীর সস্তা তারিফ কুড়াবার প্রয়াস পাচ্ছে, অথচ বহির্জগতে তারা নির্দ্বিধায় এমন সব কাজ করছে যার সাথে অন্যের স্বাধীনতা রক্ষা তথা মানবতার দূর-দূরান্তের সম্পর্কও নেই। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পিষে মারার ক্ষেত্রে মানবতার ধ্বজাধারী ঐ কপটেরা আজ অগ্রদূতের ভূমিকাই পালন করছে।

কেবলমাত্র এতটুকুই নয়, বরং ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত ধারণাই অন্তরে স্থান পেতে পারে। কিন্তু যখন ইতিহাসের কষ্টিপাথরে মুসলমানদের অতীত কার্যাবলী যাচাই করা হবে তখন এই সমস্ত ভুল ধারণার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের কথা ও কাজের মধ্যকার সমন্বয় শুধু কথার কথা নয় বরং প্রামাণিক ইতিহাসেরই বাস্তব ঘটনা। যেমন ঃ—

[এক]

হযরত আবুযর আরবের গিফার বংশের লোক ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ একদিন তিনি হযরত আবু বকরের (রাঃ) কৃষ্ণকায় দাস (মুক্তিপ্রাপ্ত) হযরত বিলালের (রাঃ) উপর চটে যান। উভয়ের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়। আবুযর (রাঃ) বেসামাল হয়ে পড়েন। বিলালকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলে উঠেন, 'হে হাব্‌শী মায়ের সন্তান'। উভয়েই হযরত রসুলে করীমের (দঃ) সাহাবী। হযরত বিলাল এই বিদ্রূপাত্মক সম্বোধন সহ্য করতে না পেরে, রসুলে করীমের (দঃ) খেদমতে আবুযরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তখন তিনি (সাঃ) কি বললেন

জানেন ? তিনি আবুযরকে তৎক্ষণাৎই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আবু-যর, তুমি তোমার ভাই বিলালের বংশের উপর কটাক্ষ করে তাকে লজ্জা দিলে ? দেখছি, তোমার মধ্যে এখনো অসভ্যতার গন্ধ রয়ে গেছে। আবু-যর (রাঃ)—যিনি মনে করতেন প্রবৃত্তির দাসত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার নামই অসভ্যতা এবং এর মধ্যে শুধুমাত্র যুবকরাই জড়িয়ে পড়তে পারে—প্রত্যু-ত্তরে বললেন, হুযুর, এই বৃদ্ধ বয়সেও কি আমার মধ্যে অসভ্যতার গন্ধ থাকতে পারে ? রসুলে করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি বিলালের সাথে যে আচরণ করেছ তা অসভ্যতাই বটে ; ইসলামের দৃষ্টিতে বিলাল তোমার আপন ভাই।

এতে আবুযর অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন। তিনি বিলালকে সম্বোধন করে বলেন, "ভাই, আমাকে এখনই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দাও এবং তোমার পায়ের গোড়ালি দিয়ে আমার দেহে আঘাত করতে থাক।"

[দুই]

বনি মাখ্যোম, কুরাইশ বংশেরই এক শাখা। বনি মাখ্যোমের একজন স্ত্রীলোক চুরিতে ধরা পড়ে। তাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ্র খেদমতে হাজির করা হয়। কুরাইশ বংশের লোক এতে অপমান বোধ করে। তারা তৎক্ষণাৎই হযরত উসামার (রাঃ) শরণাপন্ন হয় এবং সুপারিশের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরে। হযরত উসামা (রাঃ) রসুলুল্লাহ্র (সাঃ) বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি সুপারিশ করলে হয়ত স্ত্রীলোকটি দণ্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি পাবে। হযরত উসামা (রাঃ) সুপারিশ করলেনও। কিন্তু শেষ নবী (সাঃ) তখন কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্তালা স্বয়ং যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতেও কি তুমি সুপারিশ করার স্পর্ধা রাখ ? কি দুঃসাহস তোমার, উসামা !

অতঃপর সভা ডেকে তিনি (সাঃ) ভাষণ দিলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিত্তশালী কিংবা উচ্চপদস্থ লোক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হত তখন তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হত। আর কোন সাধারণ লোক যখন ঐ অপরাধ করত তখন সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর দণ্ডাদেশ জারী করা হত। আমি আল্লাহ্তালাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আজ মুহম্মদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করত তাহলেও প্রাপ্য শাস্তি ভোগ না করে সে এক পাও এগোতে পারত না। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তারও হস্তকর্তনের আদেশ জারী করতাম।

[তিন]

একদা হযরত সলমান ফারসী, সুহায়েব রুমী ও বিলাল হাবশী (রাঃ) আনসারী সাহাবীদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় কায়েস বিন মুয়াবিয়া নামক জনৈক মুনাফিক সেখানে আসে। সে সাহাবীদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃসুলভ আচরণ প্রত্যক্ষ ক'রে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে এবং মুনাফিকীর সুরে বলতে শুরু করে, 'আওস ও খাযরাজ গোত্র মুহম্মদ (দঃ)-এর সাহায্যে এগিয়ে আসবে—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। কেননা এই দুই গোত্রের যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এই অথর্ব লোকগুলি (সলমান, সুহায়েব, বিলাল) মুহম্মদ (সঃ)-এর কি কাজে আসবে? হযরত মুয়ায বিন জবল (রাঃ) কায়েসের এই মানবতা বিরোধী উক্তিটি বরদাশত করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎই তাকে ঘাড়ে ধরে রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেদমতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হুযুর, এই মুনাফিক এই এই কথা বলেছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এটা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হন, গায়ের চাদর অর্ধ-পরিহিত অবস্থায় রেখেই তিনি মসজিদের দিকে পা বাড়ান। চলার সময় তাঁর চাদরের আঁচল মৃত্তিকা স্পর্শ করছিলো। মসজিদে পেঁাছেই সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে তিনি যা বললেন ঃ "বন্ধুগণ, তোমরা যখন একই প্রভুর দাস, একই পিতার বংশধর এবং একই দ্বীনের অনুসারী, তখন এই সমস্ত বর্ণ-বৈষম্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টির মধ্যে কি কোন সার্থকতা থাকতে পারে?"

[চার]

আ'দী বিন হাতিমতায়ী মুসলমান হওয়ার পূর্বে একবার মদীনায় এসেছিলেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন একটি যুদ্ধ হতে সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করেছেন। সাহাবীরা যুদ্ধের পোশাক পরিহিত অবস্থায় তখনও তাঁকে ঘিরে রয়েছে। এমন সময় আ'দী বিন হাতিম হুযুরের খিদমতে হাযির হন। এই জঙ্গী পরিবেশে রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর প্রতি সাহাবীদের ঐকান্তিক ভক্তি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখে তার মনে হলো, যেন তিনি কোন এক মহাপরাক্রমশালী বাদশাহের দরবারে হাযির হয়েছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনার একজন দরিদ্র বাঁদী হুজুরের খিদমতে হাযির হলো। নিবেদন করলো, "হুজুর আমি একান্ত নিভৃতে কয়েকটি কথা আপনার গোচরীভূত করতে চাই।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বহুত আচ্ছা। তুমি আমাকে মদীনার যে গলির দিকেই চলতে ইংগিত কর, তোমার কথা শুনবার জন্য আমি

সেদিকেই চলতে রাজী আছি।'—এই বলে তিনি বাঁদীর অনুসরণ করলেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তার বক্তব্য শুনে স্বস্থানে ফিরে এলেন।

একদিকে রসূলুল্লাহকে বীর সিপাহীদের ভক্তিভাজন সেনাপতি এবং অন্যদিকে একজন সামান্য বাঁদীর সরল ও সহানুভূতিশীল সঙ্গী হিসাবে দেখতে পেয়ে আ'দি বিন হাতিম যারপর নেই আশ্চর্যান্বিত হন। আখেরী নবীর এই মানবতাসুলভ আচরণ তাকে সেদিন এমনভাবে অভিভূত করে যে, পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশই ছিল না।

[পাঁচ]

একুশ বছর পর্যন্ত অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করার পর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিজয়ীবেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। যারা এতদিন তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, তাঁকে জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল—আজ তিনি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তাদের শায়েস্তা করতে পারেন। প্রতিশোধ গ্রহণ করার এটাই তো ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আখেরী নবী সেদিন প্রতিশোধ গ্রহণের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন অতীতের এই সমস্ত ঘটনা তাঁর অন্তরে মোটেই রেখাপাত করতে পারেনি। যে ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকরী করার জন্য সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মক্কায় প্রচার-অভিযান চালিয়েছিলেন এবং এই পথে তাঁকে যথেষ্ট দুর্ভোগও পোহাতে হয়েছিল—আজ পুনরায় তিনি সেই দাওয়াতেরই কাজ আরম্ভ করলেন। যে কুরাইশ বংশ পার্থিব প্রভাব ও বংশগত মর্যাদার উপর ভিত্তি করে নিজেদের দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠি বলে মনে করত, তিনি তাদের সতর্ক করে বললেন ঃ—

> হে কুরাইশ বংশ, আমি আজ তোমাদেরকে আল্লাহ্তালার শেষ ফয়সালা শুনিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের অন্তর হ'তে সমস্ত অসভ্য আচরণ মুছে ফেল। বংশগত গর্বের যুগ চলে গেছে। আল্লাহতালা এই সমস্ত মানবতাবিরোধী আচরণ মোটেই পছন্দ করেন না। গোটা মানবজাতি একই আদমের সন্তান। জেনে রেখ, আদমকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর হযরত আবুবকরের (রাঃ) স্কন্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। ইতিহাস বলে, তিনি এমন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনেতা ছিলেন যাঁর অন্তর ছিল মানবতার দরদে ভরপুর।

তিনি ছিলেন যেন মানবতার মূর্তপ্রতীক। খিলাফতের গৌরবময় আসনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে, ঘরে ঘরে গিয়ে আশ্রয়হীন বালক-বালিকাদের বকরী দোহন করতে দেখা যেত। যে সমস্ত বালক-বালিকাদের পিতা জিহাদে শাহাদত বরণ করেছিলেন, তাদের বকরী দোহনের ভার তিনি স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। মানবতার তাড়নায় এই ভার তিনি আজীবন বহনও করে গেছেন। এতে কোনদিন তিনি এতটুকুও অবহেলা প্রদর্শন করেননি। এ ব্যাপারে কেউ কিছু বললে উত্তর দিতেন, 'খলীফা হওয়ার পূর্বে যে কাজ নিয়মিত করে এসেছি তা এখন ছাড়ি কি করে ?'

হযরত উমরের (রাঃ) গৌরবময় কার্যকলাপ ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে তিনি অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতেন অকাতরে এবং জালিমকে দমন করতেন কঠোর হস্তে। জনসাধারণের ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়ে তিনি নিজের ক্ষুধার কথা প্রায়ই ভুলে যেতেন। ঘরে ঘরে গিয়ে জনসাধারণের অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন। যে রাতে জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকেফহাল হতে পারতেন না সে রাতে তাঁর সুনিদ্রা হত না। এ সম্বন্ধে এমন অনেকগুলো ঘটনারই উল্লেখ করা যায় যা স্বর্ণপাতে খোদাই করে রাখার যোগ্য।

একদা হযরত উমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধকে বাজারে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, ভাই, আপনি একি কান্ড করছেন ? বৃদ্ধ উত্তরে বলল, আর কী করি বলুন, বৃদ্ধ মানুষ, গায়ে তেমন জোরশক্তি নেই। নিয়মিত খাটতে পারি না। এদিকে আবার জিযিয়া কর দিতে হয়। তাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াই। যা পাই তা দিয়ে জিযিয়া প্রদান করি। কোনমতে খাওয়া-পরাও চলে।

বৃদ্ধ লোকটি মদীনারই একজন ইহুদী। হযরত উমর (রাঃ) তার উত্তর শুনে একেবারে থ হয়ে গেলেন। বললেন, ভাই, আমি আপনার সাথে ন্যায় বিচার করিনি। শক্তি ও সামর্থ্য থাকাকালীন আপনার নিকট হ'তে জিযিয়া আদায় করেছি এবং এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে দারুণ লাঞ্ছনার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি।

অতঃপর তিনি বৃদ্ধের হাত ধরে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। নিজের খাওয়ার জন্য যা কিছু রাখা ছিল তার সবটুকুই তাকে খাওয়ালেন। অতঃপর বায়তুল-মালের খাজাঞ্চীকে আদেশ দিলেন, "এই ব্যক্তি এবং

এর অনুরূপ প্রজাসাধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাতা বরাদ্দ করে দাও, যাতে তারা খাওয়া-পরার ব্যাপারে কখনো অন্যের দ্বারস্থ না হয়।"

একদিন হযরত উমর (রাঃ) মদীনার গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি অতি ক্ষীণকায় অস্থি-চর্মসার বালিকা তার চোখে পড়ল। হযরত উমর (রাঃ) আক্ষেপের সুরে বললেন, আহা! এই ছোট মেয়েটি কার? তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) নিবেদন করলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি চিনতে পারেননি? এ যে আপনারই কন্যা। তিনি বললেন, এ আবার আমার কোন্ কন্যা? আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন, আপনারই ছেলে আবদুল্লার (অর্থাৎ আমার) কন্যা। উমর (রাঃ) বললেন, তার এরূপ অবস্থা কেন? আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তর দিলেন, আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেন বলেই তো এই দুরবস্থা। উমর (রাঃ) বললেন, বৎস! খোদার কসম, অন্যান্য মুসলমানের অনুপাতে আমি তোমাদের জন্য যা বরাদ্দ করেছি তা হতে এক কপর্দকও অধিক দিতে পারব না। এটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হোক অথবা না হোক। আল্লাহ্-তালার কিতাব আমার এবং তোমাদের মধ্যে এই ফয়সালাই করে দিয়েছে।

একবার একদল বণিক মদীনায় আগমন করে। তাদের সাথে বহু-সংখ্যক স্ত্রীলোক এবং শিশু-কিশোর ছিল। হযরত উমর (রাঃ) আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) কে বললেন, তুমি কি আজ রাতে এদেরকে পাহারা দিতে পারবে? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাতে সম্মত হন। অতঃপর উভয়ে একসঙ্গে সমস্ত রাত্রি পাহারা দেন এবং ফাঁকে ফাঁকে নফল নামাযও পড়তে থাকেন। হঠাৎ একটি শিশুর ক্রন্দনের আওয়াজ তাদের কর্ণগোচর হয়। হযরত উমর দ্রুতবেগে সে দিকে ছুটে যান এবং শিশুটির মা'কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহ্র দাসী, মহান প্রভুকে ভয় কর, শিশুটিকে কষ্ট দিও না, তাকে অমন করে কাঁদাচ্ছ কেন? —এই বলে তিনি স্বস্থানে ফিরে আসেন। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার শিশুটির ক্রন্দনের সুর ভেসে আসে। তিনি আবার সেদিকে যান এবং মা'কে পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসেন। শেষ রাতে আবার ক্রন্দন শোনা যায়। হযরত উমর (রাঃ) ব্যস্ত হয়ে সেদিকে ছুটে যান। মা'কে সম্বোধন করে বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক, শিশুটি সমস্ত রাত কেঁদে কাটালো, অথচ তুমি তার জন্য কিছুই করলে না।

পাহারাদার লোকটি যে স্বয়ং মুসলমানদের খলীফা মহান উমর—সেকথা ছিল স্ত্রীলোকটির ধারণারও অতীত। সে বিরক্তির সুরে

হযরত উমরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললো, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, তুমি সারা রাতই আমাকে অযথা জ্বালাতন করলে। আমি একে স্তন্যপান হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছি। তাই সে বার বার কাঁদছে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, কেন? সে উত্তর দিল, স্তন্যপান না ছাড়া পর্যন্ত উমর শিশুর জন্য কোন ভাতা বরাদ্দ করেন না। হযরত উমর (রাঃ) শিশুটির বয়স জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, কয়েক মাস মাত্র। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর বান্দী, এজন্য আর তোমাকে তাড়াহুড়া করতে হবে না।

তখন ফজরের সময় হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে যান। নামাযের মধ্যে কেঁদে কেঁদে তিনি এত অস্থির হয়ে পড়েন যে, তাঁর কিরাত (কুরআন পাঠ) মোটেই শোনা যাচ্ছিলো না। সালাম ফিরিয়েই (নামায শেষ করেই) তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "হতভাগা উমর, তুমি এত নিষ্ঠুর। তুমি যে কত শিশুর সর্বনাশ করেছ তা একবার ভেবে দেখেছ কি?"

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত ঘোষণা সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী প্রচার করে দিলেন, "নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শিশুকে স্তন্যপান হতে কেউ বঞ্চিত করো না। আমি শিশুদের জন্য তাদের জন্ম গ্রহণের সাথে সাথেই ভাতা নির্ধারণ করে দেব।"

এর চাইতে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? বিদেশী লোক সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনসহ রাজধানীতে এলো। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আমিরুল মুমেনীন তাদের পাহারায় নিযুক্ত হলেন, আপনজনের মত তাদের সকল অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে গেলেন।

রাত্রি জাগরণ ও পাহারাদারীর জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে আপন সঙ্গী করে নিলেন বটে, কিন্তু কর্তব্য পালনে শুধুমাত্র তাকেই সজাগ-সতর্ক দেখা গেল। সঙ্গীকে না ডেকে তিনি বার বার ক্রন্দনরত শিশুটির পানে ছুটে গেলেন। তার মাকে বার বার সতর্ক করলেন। আমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি এইরূপ অপরিচিত একটি কাফেলার শিশুদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে অনুরূপ সহানুভূতি দেখাতে পারবেন? আমরা তো কোন ছার? বিশ্ব ইতিহাসও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে উমরের (রাঃ) মত আর একটি ব্যক্তিত্ব তার অতীত, বর্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ অধ্যায়েও খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ।

———